ইউনিট-৩ বাংলাদেশের অভ্যুদয়

Emergence of Bangladesh

ভূমিকা

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এক অমোঘ পরিণতি। মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি ভারত উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিল তারই পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয় পাকিস্ড়ান ও ভারত এই দু'টি রাষ্ট্রে। পাকিস্তানের দু'টি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রধান সেতুবন্ধন ছিল ইসলাম ধর্ম। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছাড়া আর কোন বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মিল ছিল না। ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতি ও ভৌগলিক অবস্থানের সকল বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তানের এই অর্ন্ত নিহিত দূর্বলতা পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে পড়ে। পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনিবার্য ধারায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আমাদের একটি গৌরবোজ্জল অতীত আছে। সে ইতিহাস মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ইতিহাস । এই অধ্যায়ে সেই স্বর্ণময় অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটের পাঠগুলো হল নিম্নরূপ:

- *পাঠ-১ বঙ্গ, বাঙালা, বাংলাদেশ।*
- *পাঠ-২ ভাষা আন্দোলন।*
- *পাঠ-৩ ৬ দফা কর্মসূচি।*
- *পাঠ-৪ ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান।*
- *পাঠ-৫ ৭০-এর নির্বাচন ও নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলী।*
- *পাঠ-৬ স্বাধীনতা যুদ্ধ।*

বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাংলাদেশ
Banga, Bangala, Bangladesh

পাঠ-১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় আমাদের দেশটির নাম কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বঙ্গ থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাংলাদেশ

প্রচীনকালে এ দেশের নাম বাংলা বা বাংলাদেশ ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের পথ ধরে এ দেশের নাম বাংলা বা বাংলাদেশ হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এক এক সময় এদেশ শাসন করেছে। এরই সঙ্গে দেশটির নামে এসেছে বিভিন্ন পরিবর্তন। এ দেশটি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। বাংলার এই অঞ্চলগুলোকে বলা হত জনপদ, সমতট, গৌড়,বঙ্গ, বরেন্দ্র, পুন্ড্র, হরিকেল- এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। এ সব জনপদকে রাষ্ট্র বা রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকরা স্বাধীনভাবে শাসন করত। অঞ্চলগুলো ছিল অনেকটা প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের মতো।

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এক এক সময় এদেশ শাসন করেছে

বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বদিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গ জনপদ হিসেবে দু'টি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর আর অন্যটি নাব্য। বরিশাল, পটুয়াখালি ও ফরিদপুর এই তিনটি এলাকা নাব্য অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত ছিল। বঙ্গ জনপদ বহুকাল ধরে স্বাধীন ছিল। এই জনপদটিকে খুব শক্তিশালী অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে দেখা যায় ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ বঙ্গের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের সীমানা

পশ্চিমে ভাগিরথী ও করতোয়া নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর -এই বিস্তীর্ণ ভু-খন্ড নিয়ে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সম্পূর্ণ এলাকা ভগিরথীর পূর্ব তীরে কিছু অংশ বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশর অর্ন্তভুক্ত।

বঙ্গ থেকে বাংলাদেশের উৎপত্তি

ঐতরেয় অরণ্যক -গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বঙ্গ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। মোগল সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার সদস্য ইতিহাস লেখক আবুল ফজলের মতে এ দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। তাঁর মতে প্রাচীনকালে বঙ্গ অঞ্চলের রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া বিরাট আল বা বাঁধ নির্মান করতেন। সে সময় থেকে বাঙ্গাল বা বঙ্গালা নাম হয়েছে। মধ্যযুগে যখন দেশটি মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসে তখন দেশটির নাম হয় বাংলা। মুসলিম শাসক ও ইতিহাস লেখকগণ বঙ্গ বা বাংলা বলতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলাকে বুঝাতেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ প্রথম সমগ্র বাংলাকে নিজের অধিকারে আনেন। ইতিহাস লেখকগণ তাঁকে শাহ-ই বাঙ্গালা এবং সুলতানই বাঙ্গালারূপে অভিহিত করেন। এ সময় থেকেই পুরো দেশটি বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয় এবং অধিবাসীদের বাঙ্গালি বলা হত। এ কথা সত্য যে, মুসলিম আমলে বঙ্গ ও বাঙ্গলা বাংলার অংশ বিশেষের নাম ছিল । বাংলার পূর্বরূপ বাঙ্গালা নাম মুসলমানদের দেওয়া। মুসলমানরা প্রথম থেকেই সমগ্র বঙ্গ দেশকে মুলুক-ই-বাঙ্গালা বলত।

বাংলার পূর্বরূপ বাঙ্গালা নাম মুসলমানদের দেওয়া

চতুর্দশ শতাব্দী হতে বাঙ্গালা শব্দটি বিভিন্ন সমসাময়িক মুসলিম গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-তারিখ-ই ফিরোজশাহী গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। পরে হিন্দুরাও দেশের এই নাম ব্যবহার করেন। পর্তুগীজরা যখন এদেশে আসেন তখন বাঙ্গালা নাম গ্রহণ করে একে বলেন 'Bengal' বাঙ্গালা নামের

প্রথম উলে- খ পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। পরবর্তীতে লেখক জিয়াউদ্দীন বারূনী তার তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে বাঙ্গালা নামের উল্লেখ করেছেন। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গ বাঙ্গালায় রূপান্ড়রিত হয়।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা ভারতের ক্ষমতা দখল করে। এ সময় বাংলাভাষী আমাদের এ দেশটি ইংরেজদের অধিকারে চলে যায় এবং ব্রিটিশদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ব্রিটিশরা তখন ইংরেজী ভাষায় এই প্রদেশের নাম বলতো বেঙ্গল (Bengal)। আজকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ এলাকা মিলে পুরো অঞ্চলটিকে বলা হত "বাংলা"। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলাকে দু'টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। একটি পূর্ব বাংলা আর অন্যটি পশ্চিম বাংলা। হিন্দুদের প্রচন্ড বিরোধিতা ও আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বিরোধী ভারতীয়দের আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যায় এবং ভারত ও পাকিস্ড়ান নামে দুটো রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনা হল এই যে, পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়েছিল। কিন্ড়ু মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে বাংলার সংগ্রামী মানুষ পাকিস্তানী শাসনের পতন ঘটায়। ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে এক মরণপণ মুক্তিযুদ্ধে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বিকাশের মধ্যদিয়ে বাঙ্গালিরা এদেশটির নাম দেয় বাংলাদেশ। পাকিস্ড়ানের এই পরিণতি ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ দেশের মানুষ পাকিস্তানী শাসকদের শাসনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। পাকিস্তানের ইতিহাস স্বৈরশাসনের ইতিহাস। সুদীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ ভাবে যুগে যুগে এ দেশের নামের পরিবর্তন হয়েছে।

সারকথা: *বিভিন্ন পরিবর্তনের পথ ধরে এদেশের নাম বাংলা বা বাংলাদেশ হয়েছে। দেশটি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলগুলোকে বলা হত জনপদ। মধ্যযুগে দেশটি যখন মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসে তখন দেশটির নাম হয় বাংলা। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গ বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হয়। আজকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ এলাকা নিয়ে পুরো অঞ্চলকে বলা হত বাংলা। ১৯৭১ সালে এক গৌরব উজ্জ্বল রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে এ দেশটির নাম হয় বাংলাদেশ।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন

১। প্রাচীনকালে এদেশের নাম ছিল-

(ক) বাংলা;
(খ) বাঙ্গালা;
(গ) বঙ্গ;
(ঘ) বাংলাদেশ।

২। এদেশের অধিবাসিদের বলা হত -

(ক) বাংলাদেশী;
(খ) বাঙ্গালি;
(গ) বঙ্গী;
(ঘ) বঙ্গাল।

৩। বাংলা ২টি প্রদেশে বিভক্ত হয়-

(ক) ১৯০৫ সালে;
(খ) ১৯০৬ সালে;
(গ) ১৯৭১ সালে;
(ঘ) ১৯৪৭ সালে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। প্রাচীন বঙ্গরাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত করুন।

রচনামুলক প্রশ্ন

১। ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় কিভাবে বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি হয়েছে আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১-গ, ২-খ,৩-ক

সহায়ক গ্রন্থ

১। *ড. আব্দুল করিম, বঙ্গ, বাঙ্গালা, বাংলাদেশ*
২। *রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৪।*
৩। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৭।*

পাঠ-২

ভাষা আন্দোলন
Language Movement

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি

১৯৪৭ সালে হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করার সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এর প্রতিবাদে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহ 'পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, 'বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা গ্রহণ করা হইলে উহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে'। তিনি আরো বলেন, 'একটি গাছ যেমন মাটি, বাতাস, আলো, সিক্ততা এবং সর্বোপরি তার নিজস্ব অঙ্কুরকে অবলম্বন করে আপন স্বভাবে বর্ধিত হয়, ভাষা-সংস্কৃতিও তেমনি একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, ইতিহাস, মনুষ্যস্বভাব এবং আকা ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। মানুষকে কখনো তার সংস্কৃতি থেকে বিযুক্ত করা যায় না। একটি দেশে যদি একটি মাত্র সংস্কৃতি-ধারা থাকে তাহলে সে দেশটি বৈচিত্র্যহীন এবং সেই কারণে তাৎপর্যহীন একটি দেশ। মরুভূমিতে যেমন বৈচিত্র্য নেই, পৃথিবীর সব মরুভূমিই একরকম, তেমনি পাকিস্তান যদি পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল মিলিয়ে একই সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয় তাহলে পাকিস্ড়ান হবে বৈচিত্র্যহীন এবং সেই কারণে তাৎপর্যহীন একটি দেশ।'

লেখক সমাজ পাকিস্তানের শুরুতেই উর্দুভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব বাংলার উপর কিরূপ অবিচার হবে এবং সাংস্কৃতিক জীবনে কিরূপ সংকটের সৃষ্টি হবে সেদিকে তাঁরা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাৎপর্যমন্ডিত ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দুন মজলিসে'র উদ্যোগে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এই নামে একটি স্মরণিকা বের করা হয়। ঐ স্মরণিকায় আবুল মনসুর আহমদ বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা' ও জাতীয় ভাষারূপে চাপিয়ে দেবার বিপদ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে বলেছিলেন-'উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারী চাকুরীর অযোগ্য বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফার্সী জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারী কাজের অযোগ্য করিয়াছিলেন।'

মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া প্রতিটি নাগরিকের দেহ ও মনের সর্বাংগীন বিকাশ সাধন করা একেবারেই অসম্ভব

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমুদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দানের প্রথম প্রকাশ্য দাবি তোলা হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'- এই দাবি পর্যায়ক্রমে সার্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ করার ক্ষেত্রে তমুদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল উলে-খযোগ্য। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের বক্তব্য ছিল খুবই তাৎপর্যমন্ডিত। 'ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মাতৃভাষার সাহায্য ছাড়া প্রতিটি নাগরিকের দেহ ও মনের সর্বাংগীন বিকাশ সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় হিব্রু ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধশালী ভাষা হিসেবে পরিগণিত হতো, কিন্তু সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়ার জন্যেই অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষা আরবিতে পবিত্র কোরআন শরীফ নাজেল হয়। আরবির পরিবর্তে সেদিন যদি অন্য কোন ভাষায় কোরআন শরীফ নাজেল হতো তবে আরববাসীদের পক্ষে ইসলামের বাণী অতি অল্প সময়ে গ্রহণ করা সম্ভব হতো না।' তাঁরা আরো বলেন—বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরূদ্ধে এক শ্রেণীর লোকের কাছে সস্তা যুক্তি

প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, বাংলা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন এবং হিন্দু সাহিত্যিকদের। কোরআন শরীফ যে সময় অবতীর্ণ হয় সে সময় আরবি কাদের ভাষা ছিল? পুতুল পুঁজারী পৌত্তলিক নাসারাদের নয় কী? তাহলে আরবি ভাষাকে পবিত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া কেন? আসলে ভাষা ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র।

ভাষা ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবে বলেছিলেন, পাকিস্ড়ানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলাই গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হওয়া উচিত। তিনি আরো জোর দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা হিসেবে বাংলা তার যোগ্য মর্যাদা পাবার দাবি নিশ্চয়ই জানাতে পারে। উত্তরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানান যে, একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু এবং অন্য ভাষা নয়।

১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্ড়ানের প্রতিষ্টাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ আসেন পূর্ব পাকিস্তানে। লক্ষ লক্ষ জনতা হাজির হয়েছেন রেসকোর্স ময়দানে। পূর্ব বাংলা তখন মুখর, ছাত্র-জনতার একই আওয়াজ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সকলকে স্তম্ভিত করে জিন্নাহ ২১ মার্চ রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় ঘোষণা করলেন, 'I tell you, Urdu alone shall be the state language of Pakistan'। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একথা আপনাদেরকে পারিষ্কার করে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্ড় ানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। এ ব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ড় করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রেসকোর্সে উপস্থিত জনতার 'না, না' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এই কঠিন আঘাতে জমায়েত লক্ষ মানুষ সেদিন আশ্চর্য হয়েছিল। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্জন হলে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে এসে জিন্নাহ্ পাকিস্ড়ানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে রেসকোর্সের কথাই পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, 'প্রিয় ছাত্রগণ আমি তোমাদের জানাতে চাই যে, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ছাত্ররা সমস্বয়ে এর প্রতিবাদ জানায়।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে 'মৌলিক নীতিমালা কমিটির' প্রকাশিত রিপোর্ট-এ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়। শতকরা ৫৬ জন লোকের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ার অর্থ সেই ভাষাকে ধ্বংস করে দেওয়া। মাতৃভাষার প্রতি এই অবমাননার ফলে বাঙালিদের মনে তীব্র অসন্ড়োষ দানা বেঁধে ওঠে। জনমনে ভীষণ ক্ষোভ দেখা দেয় আর ঐ অসন্তোষের মুখে গভর্ণর জেনারেল নাজিমউদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারি ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং আন্দোলনের গতি নতুন রূপ নেয়। নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যে সংগ্রামী ছাত্র জনতা-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ঐ উক্তির প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা ধূলিস্যাৎ করার মানসে সচেতন ছাত্র সমাজ 'রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠন করেন। কাজী গোলাম মাহবুব পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস এবং হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয় হয় এবং উক্ত দিবসকে সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। ঐ দিন অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে। নুরুল আমিন সরকার ঐ দিন ১৪৪ ধারা জারী করে এবং মিছিল শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বীর বিক্রমে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', '১৪৪ ধারা মানি না-মানব না'- ইত্যাদি পোগানে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মিছিল বের করলে পুলিশ ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ধর্মঘটী ছাত্র নিহত হলেন। এই মৃত্যুকে উপলক্ষ করে গণজাগরণের বিস্ফোরণ ঘটে; দাবানলের মত সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারিতেও ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজার হাজার লোক 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'খুনী নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'পুলিশী জুলুম চলবে না, চলবে না', ইত্যাদি পোগান দিতে দিতে ঢাকার প্রধান

পথগুলো অতিক্রম করে—আবদুল গাফফার চৌধুরী জনমনের সেই বিশেষ অবস্থাটি ধরে রেখেছেন তাঁর অমর 'একুশের গানে', **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'**। এই গানের সুরে সুরে সেদিন বাংলার আকাশে-বাতাসে পথে ঘাটে নেমে এসেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন চেতনা। উলে- খ্য যে, ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ছিল ছাত্র সমাজ।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু একটা ঘটনা নয়, এটা সমগ্র জাতির সর্বকালের জন্যে একটা চেতনা আর দিক নির্দেশনার দিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের বীজ থেকে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে এদেশের সংগ্রামী মানুষ দুর্বার আন্দোলনের পথ ধরে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে কয়েকজন তরুণ যুবক বুকের তাজা রক্ত ঢেলে গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিল এই দেশ ও জাতির স্বাধিকার চেতনার। ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিকরা ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করে গেছেন যে, জাতীয় স্বকীয়তা জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একুশে ফেব্রুয়ারির সেই মহালগ্ন থেকেই বাঙালির সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সূচনা এবং এ সংগ্রাম থেকেই বাঙালিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নিপীড়নের আসল চেহারা। ভাষা আন্দোলন সেই শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা যুগিয়েছে। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের জনগণ ১৯৭১ সালে রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানী অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে।

বস্তুতঃ যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা পাকিস্ড়ানের ভাঙ্গন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পর পরই, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন ছিল এক নতুন দিকদর্শন। এই আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে বৈপ- বিক চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে তা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-র গণ-অভ্যুত্থান ও আইয়ুব শাহীর পতন, '৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন বাঙালিকে স্বাধীন জাতি হিসেবে জেগে ওঠার মন্ত্র দিয়েছে এবং এর সংগ্রামী শিখা তাঁদের চলার পথকে করেছে আলোকিত। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির সংগ্রাম অর্থনৈতিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং জাতীয়তাবাদের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। তাই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গণজাগরণের ইতিহাস।

সারকথা: *ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এটা সমগ্র জাতির সর্বকালের জন্য একটা চেতনা আর দিক নির্দেশনার দিক। ভাষা আন্দোলন এদেশবাসীকে স্বৈরাচারী শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসানকল্পে প্রতিবাদ করতে সাহস যুগিয়েছে। ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছে। ১৯৫২ সালের পরবর্তীকালে যে কোন ধরনের আন্দোলন বা সংগ্রাম ভাষা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ১৯৪৭ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন-
ক. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;
খ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;
গ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য;
ঘ. করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

২. তমুদ্দন মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন-
ক. ড. মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ;
খ. অধ্যাপক আবুল কাসেম;
গ. ফররুখ আহমদ;
ঘ. ড. এনামুল হক।

৩. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কোন দলের সদস্য ছিলেন?
ক. আওয়ামী লীগের;
খ. মুসলিম লীগের;
গ. কংগ্রেসের;
ঘ. কম্যুনিস্ট পার্টির।

৪. ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহবায়ক ছিলেন-
ক. শেখ মুজিবুর রহমান;
খ. কাজী গোলাম মাহবুব;
গ. তাজউদ্দিন আহমদ;
ঘ. আতাউর রহমান খান।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভাষা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন।
২. ১৯৫২ সালের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ ১ ক, ২ খ, ৩ গ, ৪ খ।

সহায়ক গ্রন্থ

একুশের স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪।

পাঠ-৩

৬-দফা কর্মসূচি
6- point Progrmme

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ৬ দফা কর্মসূচির পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ৬ দফা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ৬ দফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানী শাসকচক্র পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্ড়ানের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী যতই শোষণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালাতে থাকে পূর্ব বাংলার জনমনে পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ ততই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শাসকশ্রেণীর সুপরিকল্পিত নীলনকশার ফলে পাকিস্ড়ানের দু'টি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য গড়ে উঠে। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনমনে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তীব্র হয়ে উঠে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারতের যুদ্ধকালে সামরিক ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রতি চরম অবহেলা স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে আরও জোরদার করে তুলে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার এই প্রতিবাদ ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে। পাকিস্ড়ানের সামরিক ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান বহন করা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। নিরাপত্তার প্রশ্নে এই অঞ্চলের মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার দাবী তোলে। পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চরম হতাশার পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিতে ১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরাধীদলের এক বৈঠকে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তার ওই ঘোষণা ছিল বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ দাবী।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবীতে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

৬ দফা কর্মসূচি

প্রথম দফা : শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে এবং আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

দ্বিতীয় দফা : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র-এই দু'টি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ড় বিষয় প্রদেশগুলোর হাতে থাকবে।

তৃতীয় দফা : মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি স্টেট ব্যাংক ও দু'টি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

ক. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এই অবস্থায় শাসতন্ত্রের এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে। এই বিধানে পাকিস্ড়ানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চতুর্থ দফা : রাজস্ব কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা

সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থাকবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্ব-এর নির্ধারিত অংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পঞ্চম দফা : বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়েছে।

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্ড়ানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা-দুই অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারে আদায় হবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলবে।

৫. বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানী-রফতানি করার জন্য আঞ্চলিক সরকারকে শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে।

ষষ্ঠ দফা : আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

এই দফায় পূর্ব পাকিস্ড়ানে প্যারা-মিলিটারী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের সুপারিশ এবং পূর্ব পাকিস্ড়ানের অস্ত্র কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

৬ দফার গুরুত্ব

৬ দফা কর্মসূচি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচী সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে জনগণের হৃদয় জয় করে নিল। পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সরকারী কর্মকর্তাসহ, সর্বস্ড়রের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৬ দফা কর্মসূচী সমর্থন করেছিল। ৬ দফার মূল বক্তব্য ছিল, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয় বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপারে পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার মধ্যে দেশের দুই অঞ্চলের মাঝে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দাবী নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে ঘোষণা করে জনগণকে চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। সর্বস্তরের জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। শুরু হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এক গণজাগরন। কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের শক্ত ভিতকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল। ৬ দফা আন্দোলন পাকিস্ড়ানী শাসকচক্রকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয় যে, সামরিক শক্তি নয়, গণশক্তিই হচ্ছে সকল রাজনৈতিক শক্তির উৎস। আওয়ামী লীগ ৬ দফার সংগ্রাম শুরু করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আবশ্যিক পটভূমি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন, ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন ম্যাগনা কার্টা ও অধিকার বিল, ফরাসী বিপ্লবের ভিত্তি যেমন সাম্য ও স্বাধীনতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার তেমন মৌল ভিত্তি ছিল ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি। ৬ দফাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয়েছিল।

তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে ৬ দফা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কর্মসূচির গুরুত্ব আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

***সারকথা** ঃ ৬ দফার মূল বক্তব্য ছিল, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয় বাদ দিয়ে সমস্ত বিষয়ে পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্ড়ানের মাঝে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরেন। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানে ও ক্রমবিকাশে ৬ দফা কর্মসূচির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগ ৬ দফার সংগ্রাম শুরু করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের আবশ্যিক পঠভূমি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের-স্বাধীনতা সংগ্রামে ৬ দফা কর্মসূচির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন ?

(ক) এ.কে ফজলুল হক;

(খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী;

(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান;

(ঘ) মাওলানা ভাসানী।

২। কত সালে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় ?

(ক) ১৯৬৫;

(খ) ১৯৫২;

(গ) ১৯৭১;

(ঘ) ১৯৬৬।

৩। স্বল্প সময়ে কোনদল জনগণের হৃদয় জয় করেছিল ?

(ক) মুসলিম লীগ;

(খ) আওয়ামী লীগ;

(গ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি;

(ঘ) বিএনপি।

৪। বাঙালির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ দাবী ছিল-

(ক) ৬ দফা;

(খ) ২১ দফা;

(গ) ৫ দফা;

(ঘ) ১১ দফা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ৬ দফার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ৬ দফা কর্মসূচীর দফাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. ক

সহায়ক গ্রন্থ

১। আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা, আওয়ামী লীগের প্রকাশিত পুস্তিকা-১৯৬৬।

২। ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৮

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

পাঠ-৪

Mass Upsurge of 1969

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ছাত্রসংগ্রাম কমিটির ১১ দফা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।

ঊণসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বা গণআন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের কথিত লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধির ফলে মিলিটারী, পুলিশ ও আমলার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বহুলাংশে হ্রাস পায়। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে সরকার আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। উল্লেখ্য যে ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল ৬৯ এসে তা প্রচন্ড গতিবেগ লাভ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে একটি বিরাট মাইল ফলক।

মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান

গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি

১৯৬৮ সালের শেষভাগে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্ররূপ ধারন করে। ৭ ডিসেম্বর মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আহবানে পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রদেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয়। ১৪ ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং ২৯ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা করা হয়। এ ভাবে একের পর এক কর্মসূচির সুবাদে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

সারা দেশের মানুষ যখন আন্দোলনমুখী তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯'র ৪জানুয়ারী ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আলোড়ন সৃষ্টিকারী ১১ দফা কর্মসূচি আন্দোলনে নতুন গতিবেগের সঞ্চার করে। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হবার পরপরই ৮ জানুয়ারী সাতটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'ডাক' (Democratic Action Committee) কমিটি গঠন করা হয়। সকল কালাকানুন বাতিল, শেখ মুজিবের মুক্তিসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি সম্বলিত ৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এই কমিটি। ১৯৬৯'র ১৭ জানুয়ারী ঢাকা শহরে দু'টি পৃথক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি বায়তুল মোকাররমে ডাক-এর আহবানে, অন্যটি বটতলায় ছাত্রদের আহবানে। সরকার ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। বায়তুল মোকাররমে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ ঘটে। ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে পড়লে ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী দিনও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ হয়।

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২০ জানুয়ারি বটতলায় ছাত্রসভার আয়োজন ও প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়। সভার পর হাজার হাজার ছাত্রের মিছিল রাস্তায় নামলে শত শত পুলিশ আর ই.পি.আর. বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১১ দফা আদায়ের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুতে গণজাগরণের বিস্ফোরণ ঘটে। এতদিনের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের স্তরে উন্নীত হয়। আইয়ুবী শাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক স্থানে আইয়ুবের নামফলক নামিয়ে ফেলে। এ ভাবে আইয়ুব গেট হয়ে যায় 'আসাদ গেট'।

ছাত্র-জনতা আইয়ুবী শাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে

ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল ও শোক দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২৪ জানুয়ারি ঢাকা শহরে সর্বাত্নক হরতাল পালন করা হয়। ওই দিন হরতাল মোকাবিলার জন্যে নামানো হয় সেনাবাহিনী। বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিতে নবকুমার

স্কুলের ছাত্র মতিয়ুর রহমান নিহত হওয়ার ফলে সেদিনের প্রতিবাদ বিদ্রোহ এবং জনতার রোশের আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছিল দৈনিক পাকিস্তান ও মনিং নিউজ পত্রিকার অফিস। বিপ্লবী জনতা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। ১৫ ফেব্রুয়ারী আগড়তলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। ১৮ ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে সৈনিকরা। ড. জোহার মৃত্যু ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয় এবং সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সেদিন সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসায় ঢাকার রাজপথে রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' 'কারফিউ মানিনা', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব' প্রভৃতি পোগান।

গণঅভ্যুত্থানের ফলে ২০ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলা থেকে সান্ধ্য আইন তুলে নেয়া হয়। ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং শেখ মুজিব একটি জনপ্রিয় নামে পরিণত হলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারী রমনা রেসকোর্স ময়দানে, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১১ দফা দাবিসমূহ

'১। ক.স্বচ্ছল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে যে সব কলেজ প্রাদেশিকীরণ করা হয়েছে সেগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ন ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবি মানতে হবে, ছাত্র বেতন কমাতে হবে, নারী শিক্ষার প্রসার করতে হবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে।

খ. কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।

গ. শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'মাহমুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করতে হবে এবং ছাত্র সমাজের ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মেনে নেয়ার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

ক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হতে হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতির এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হতে হবে সার্বভৌম।

খ. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অঞ্চলের সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

গ. দুই অঞ্চলের জন্যে একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে। এই বিধানে পাকিস্ড়ানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

ঘ. সকল প্রকার রাজস্ব-খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিতে হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর নির্দেশ থাকবে।

ঙ. কেন্দ্রের কাছে অর্জিত প্রতি রাষ্ট্রের বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি রফতানি চলবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি রপ্তানি করবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ড় করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে।

চ. পূর্ব পাকিস্ড়ানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করতে হবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্ড়ানিদের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৫. ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬. কৃষকদের উপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের ধর্মঘটের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বহির্ভুত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করতে হবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।'

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল মূলতঃ আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলন। আসাদ, মতিয়ুর, সার্জেন্ট জহুরুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহার মৃত্যু এই আন্দোলনকে প্রাণ দিয়েছিল। আর ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি বা দাবী এ আন্দোলনকে করে তুলেছিল তীব্র। যার ফলশ্রুতিতে আইয় ব খান ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন আর পরবর্তী শাসক ইয়াহিয়া খানও ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

সারকথা: *পাকিস্তানের ২২ বছরের গণআন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ছিল একটি দেশ-কাঁপানো অভ্যুত্থান। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন হয়। উলে-খযোগ্য ঘটনা হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিলাভের ফলে গণচেতনার উন্মোষ ঘটে। ছাত্রসংগ্রাম কমিটি গণঅভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ছাত্রসমাজ কৃষক-শ্রমিক ও পেশাজীবীর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।*

পঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর হরতাল আহবান করছিল কে?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব;
খ. মাওলানা ভাসানী;
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ;
ঘ. আতাউর রহমান;

২. ১৯৬৮, ৬৯ সালে ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল কোন দল?
ক. আওয়ামী লীগ;
খ. ভাসানী ন্যাপ;
গ. কম্যুনিস্ট পার্টি;
ঘ. মুসলিম লীগ।

৩. ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল-
ক. ছাত্রলীগ;
খ. ছাত্র ইউনিয়ন;
গ. ছাত্র সংগ্রাম কমিটি;
ঘ. আওয়ামী লীগ।

৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কখন প্রত্যাহার করা হয়েছিল?
ক. ২০ ফেব্রুয়ারী;
খ. ১১ ফেব্রুয়ারী;
গ. ২২ ফেব্রুয়ারী;
ঘ. ২৩ ফেব্রুয়ারী।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি আলোচনা করুন।

উত্তরঃ ১. খ, ২. খ, ৩. গ ও ৪. গ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *মাহফুজউল-াহ, অভ্যুত্থানের উণসত্তর, ঢাকা ১৯৮৩*
২. *মেজবাহ কামাল, আসাদ ও উণসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ঢাকা-১৯৮৬*

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও নির্বাচন উত্তর ঘটনাবলী

পাঠ-৫

The Election of 1970 and Post Election Period Events

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- নির্বাচনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পটভূমি

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্তরিত হয়। তাই সত্তরের নির্বাচন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উল্লেখ্য যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র দেশব্যাপী এটাই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ঐ নির্বাচনী ফলাফলকে কেন্দ্র করে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্ড়ান পিপলস্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বনাম শেখ মুজিব ও এদেশের মানুষের আশা আকাঙক্ষার মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় তারই অনিবার্য পরিণতিতে বাংলার সংগ্রামী জনতা এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্ড়ানী কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকগোষ্ঠী সত্তর সালের নির্বাচনী গণরায়কে অস্বীকার এবং বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র না করার ফলে পাকিস্ড়ানের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই নির্বাচনের পরে স্বায়ত্তশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্ড়রিত হয়

১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পতন এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ-এই পটভূমিতে সুদীর্ঘ তেইশ বছর পরে ১৯৭০ সালে প্রাপ্ত-বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন ছিল খুবই তাৎপর্যমন্ডিত। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পাকিস্তানে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকায় কোন একটা দলের পক্ষে জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। আর তিনি বিভিন্ন দলের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মতো দেশের উপর এমন একটি শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিতে পারবেন যা মূলতঃ কায়েমী ও স্বার্থবাদী শাসক চক্রের ক্ষমতাকেই টিকিয়ে রাখবে।

ক্ষমতাসীন সামরিকচক্র কেন্দ্রে একটি দুর্বল কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলতে থাকে। ইয়াহিয়া খান অতি সতর্কতার সাথে তার পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ছোট- বড়ো সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক মতভেদ সৃষ্টি করা এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে পরস্পরের প্রতি দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করা। জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সামরিক বাহিনীর রাওয়ালপিন্ডিস্থ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জেনারেলদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দিলেই সামরিক বাহিনীর স্বার্থ রক্ষা হবে। প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদেরও এই অভিমত ছিল। তারা আইয়ুব খানের শেষ দিনগুলোর ঘটনাবলী উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে দেখালেন যে, জোর করে সামরিক শাসন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে সমগ্র পাকিস্তান একসঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ ঘটাতে হবে। শাসক মহলের এই সব অনুমানের পরিপ্রেক্ষিতেই ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন।

শেখ মুজিব আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বাংলার মানুষের হৃদয় জয় করে নিতে সক্ষম হন।

নির্বাচনী ইস্তেহারে আওয়ামী লীগ 'ছয় দফা' কর্মসূচীর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা, শোষণহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিকে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনকে 'ছয়-দফা'র উপর 'গণভোট' বলে উল্লেখ করেন। মুজিবের সাথে ভুট্টোর মৌলিক পার্থক্য ছিল 'ছয়-দফা' কর্মসূচি নিয়ে। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্ড়ানের মধ্যে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বাংলার মানুষের হৃদয় জয় করে নিতে সক্ষম হন। আওয়ামী লীগ 'জয়বাংলা' পোগানের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্পৃহা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

নির্বাচনী ফলাফল

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশভাবে জয়ী করে। জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে

আওয়ামী লীগ। ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন সদস্য সকলেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হন; অনুরূপভাবে পিপলস্ পার্টির ৮৮টি আসনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত। দু'টি দলই আঞ্চলিক আধিপত্য ও প্রাধান্য লাভ করে এবং দু'টি দলই অন্য অঞ্চল থেকে কোন আসন লাভ করে নি। সুতরাং নির্বাচনী ফলাফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দেশের দু'অংশের জনমত সম্পূর্ণ বিভক্ত। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের চরম অবজ্ঞা ও উদাসীনতার বিরুজনতার রুদ্ররোষের বহিঃপ্রকাশ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যকার বিরাজিত অর্থনৈতিক বৈষম্য বাঙালিদের মনে প্রচন্ড বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

নির্বাচনের উলে- খযোগ্য দিক হল দু'টি দলই আঞ্চলিক আধিপত্য ও প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু অন্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্ড়র করতে পারেনি।

নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্তানের কায়েমী শাসনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। বাংলাদেশের জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি সুস্পষ্ট রায় প্রদানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিল যে, তারা শোষণ ও বঞ্চনার অবসান চায়।

নির্বাচনোত্তর ঘটনাবলী

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন যে, 'ছয় দফা' কর্মসূচির ভিত্তিতেই দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে এবং এ বিষয়ে কোন আপোস নেই। পক্ষান্তরে ভূট্টো বললেন যে, 'ছয় দফা' ভিত্তিক শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে আঘাত হানবে। তিনি হুমকি দিয়ে বললেন যে, যদি আওয়ামী লীগ এককভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকে এবং এককভাবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় তাহলে তিনি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে হরতাল আহবান করে প্রশাসন ব্যবস্থা অচল করে দেবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধুই হলো পাকিস্তানের ক্ষমতার উৎস এবং কেন্দ্রস্থল। আর এই দুই প্রদেশে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং দেশের স্বার্থ এবং জনগণের সেবা করার জন্যে তাকে ক্ষমতায় যেতেই হবে। ভুট্টোর এই দাবীর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে আর এই সংখ্যাগরিষ্টতার বলে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের অধিকার আওয়ামী লীগেরই রয়েছে। এইভাবে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়।

গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন ও দেশ শাসনের দাবীদার।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পর আওয়ামী লীগ বৈধভাবে শাসনতন্ত্র রচনা ও শাসনভার গ্রহণের আশা করেছিল। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন ও দেশ শাসনের দাবীদার। কিন্তু জুলফিকার আলী ভূট্টোর অনমনীয়তা সৃষ্টি করেছিল এক অচলাবস্থা। ভুট্টোর মাধ্যমে কিছু শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক সৃষ্টি করে জেনারেল ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন ডাকছেন করে টালবাহানা শুর" করেন। অতঃপর ৩রা মার্চ '৭১, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষিত হয়। কিন্তু ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্ত গণবিস্ফোরণ ঘটে। বাংলার সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পোগান ওঠে, 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ', ইত্যাদি। সেই সঙ্গে 'জয় বাংলা' পোগানের ধ্বনিতে সমস্ত বাংলাদেশ মুখরিত হতে থাকে। বিদ্রোহ দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা চরম ঘৃণা ও ক্ষোভে পাকিস্তানী পতাকা পুড়িয়ে ফেলে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র-সমাজের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মানচিত্র-খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলিত হয়। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন ত্যাগ এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়। ৩রা মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্র প্রচার করা হয়। উক্ত সভায় প্রচারিত স্বাধীনতার ইস্তেহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ ঐতিহাসিক সভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, শিক্ষক-কর্মচারী সকলেই যোগ দিলেন অসহযোগ আন্দোলনে। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মানুষ

এক ইস্পাত কঠিন ঐক্যে উপনীত হয়। জনতার অমিত তেজ, আত্মপ্রত্যয় ও সংগ্রামী চেতনা ক্রমশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হতে থাকে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবী তুলতে থাকে।

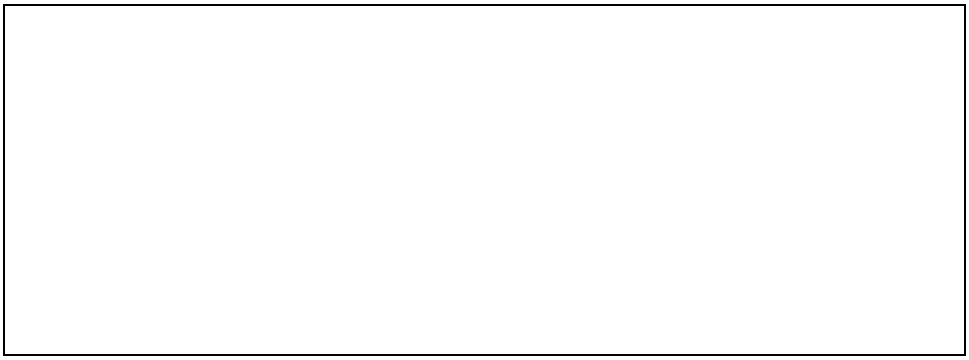

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে এক ভাষণ রাখেন। ইতিহাসে তা ৭ই মার্চের ভাষণ নামে খ্যাত। বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের ঐ দিকনির্দেশনামূলক ভাষণটি আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐ ভাষণে পাকিস্ড়ান রাষ্ট্রে বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরে বাঙালির জাতীয় মুক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন: ''ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল-াহ। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'' বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর জনগণ আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। ৮ই মার্চ থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। গণআন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সমস্ত স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রদেশের সমগ্র প্রশাসন কার্যত এক বিকল্প সরকারে পরিণত হয়। ক্যান্টনমেন্টগুলো ছাড়া পূর্ব বাংলার সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রায় বিলীন হয়ে যায়। অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোনরূপ আগ্রহ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, ভ ট্টো বা কোন জেনারেলদের ছিল না। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ড় পূর্ব পাকিস্ড়ানে ব্যাপক গণবিক্ষোভ এবং সাধারণ মানুষ ও সর্বদলীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ইয়াহিয়া ও তার সামরিক বাহিনীর সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, বাংলার মানুষ আওয়ামী লীগের পিছনে ঐক্যবদ্ধ। সামরিক বাহিনী তখন এই সিদ্ধান্ড় উপনীত হয় যে, একমাত্র চূড়ান্ড় আঘাতের মাধ্যমেই বাঙালিদের সংগ্রামী চেতনা প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে। সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন ও গণহত্যার পরিকল্পনা চূড়ান্ড় করার জন্যে প্রয়োজন ছিল কিছু সময়ের। তাই কৌশল হিসাবে ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনার প্রহসন করেছিলেন। ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র সমস্ত নিয়মতান্ত্রিকতার ও গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে বাংলাদেশের মানুষকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয়।

সারকথাঃ *১৯৭০-এর নির্বাচন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মানুষ এই নির্বাচনে একটি সত্তায় পরিণত হয়। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬-দফার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্ড়নী শাসনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। পাকিস্ড়নের শাসকচক্র নির্বাচনী রায়কে অস্বীকার করার ফলে সংগ্রামী জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার দাবি তুলতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল ১৯৭০ সালের নির্বাচনী গণরায়কে অস্বীকার করায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনিবার্য ধারায় অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থনে পতন হয়েছিল
ক. ইয়াহিয়া খানের;
খ. আইয়ুব খানের;
গ. ভূট্টোর;
ঘ. টিক্কা খানের।

২. জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করেছিল?
ক. ১৬৭টি;
খ. ১৬৮টি;
গ. ১৬৯টি;
ঘ. ১৭০টি।

৩. জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল
ক. ৩১৩টি;
খ. ৩১০টি;
গ. ৩১২টি;
ঘ. ৩০৯টি।

৪. ৩রা মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রচার করে
ক. আওয়ামী লীগ;
খ. যুবলীগ;
গ. ছাত্রলীগ;
ঘ. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

৪. কখন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ?
ক. ২ মার্চ;
খ. ৭ মার্চ;
গ. ৮ মার্চ;
ঘ. ২৫ মার্চ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ক, ৩. ক, ৪. ঘ, ৫. গ

সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্বাধীনতা যুদ্ধ
War of Independence

পাঠ-৬

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মুক্তি যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র ও নিরাপরাধ বাঙালির বিরুদ্ধে পাক-বাহিনী আকস্মিক হামলা, নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। মূলত ঢাকার বুকে নির্বিচারে হত্যাকান্ড, বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ই.পি.আর)-এর সদর দফতরে পাকিস্ড়ানি বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণের খবরে ঘটনা মোড় নিল অভাবনীয় বিদ্রোহের পথে। পাকিস্ড়ানি বাহিনী যথাক্রমে বাঙালি পুলিশ, ই.পি.আর, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের ঢালাওভাবে হত্যা করতে শুরু করেছে এই সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে অধিকাংশ বাঙালি আত্মরক্ষা ও দেশপ্রেমের মিলিত তাগিদে, স্বাতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধ শুরু করে। স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র তুলে নিল লাখ লাখ বাঙালি। শুরু হল স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ।

'৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানে গড়িমসি, সর্বোপরি অধিবেশনের তারিখ ঘোষিত হবার পর তা বানচাল করে দেওয়ার জন্য ভ ট্টোর বিশেষ তৎপরতা এবং ইয়াহিয়া খানের দুরভিসন্ধি- প্রভৃতি ঘটনার ফলে পূর্ববাংলার জনগণ পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি

সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারিয়ে ফেলে, দেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা বাংলাদেশের জনগণের জন্য এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা হয়ে দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত উপায়ে যুদ্ধ চালনা এবং একই সঙ্গে সারাদেশে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে সমন্বয়বিহীন আন্দোলন। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিবাহিনী গঠন, সমন্বয় সাধন এবং গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের প্রকৃতি। সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত গেরিলা আক্রমণ দুর্বার ও তীব্র করে তোলা এবং সংঘর্ষে সাফল্য লাভ। তৃতীয় পর্যায়ঃ ৪ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ অভিযান এবং পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ। যে কোনো মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিচালনার জন্য প্রধান আবশ্যকীয় শর্ত চারটি। এক. ব্যাপক জনসমর্থন, দুই. মুক্তি সেনাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, তিন. সমরাস্ত্রসহ বিভিন্ন উপকরণের নিয়মিত সরবরাহ, এবং চার. সর্বোপরি নৈতিক মনোবল। এই চারটি শর্তই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে ছিলো।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে মধ্যরাতে পাকিস্ড়ানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অর্থাৎ ঘড়ির কাটা অনুযায়ী ২৬ মার্চ প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই ঘোষণায় তিনি পাকিস্ড়ানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বস্ব নিয়ে প্রতিরোধের নির্দেশ দেন। এতে হলা হয়ঃ

`This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved'.

(সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃঃ১)।*

অর্থাৎ ''এ আমার শেষবাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানে থাকো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার বাহিনীর প্রতিরোধ করো। বাংলাদেশ হতে পাকিস্ড়ানী সেনাবাহিনীর শেষ ব্যক্তিকে না তাড়ানো এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ড় তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।''

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজি বার্তাটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন ইপিআর-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পৌঁছে দেয়া হয়। এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (চট্টগ্রাম) থেকে ২৬ মার্চ প্রচারিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতা ঘোষণা একই বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও জাতীয় পরিষদ সদস্য এম. এ. হান্নান ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপসহ আরো কয়েকজন একাধিকবার পাঠ করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান) বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ও তাঁর নেতৃত্বে সরকার গঠন সম্পর্কিত আরেকটি ঘোষণা দেন (সূত্রঃ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খন্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃঃ২)।*

মুজিবনগর সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে সংঘটিত, পরিচালিত ও রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি আনুষ্ঠানিক সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। এছাড়া, একটি 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' ও তারা গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহাকুমার (তৎকালীন) বৈদ্যনাথ তলায় ('মুজিবনগর' নামে খ্যাত) দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও স্থানীয় বিপুল সংখ্যক জনগণের উপস্থিতিতে নবগঠিত সরকার (যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত)

আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। একই অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম এন এ 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করেন, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার 'সাংবিধানিক ঘোষণা ('Constitutional Proclamation') হিসেবে চিহ্নিত। এতে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন করা হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের সুস্পষ্ট 'ম্যান্ডেট' পেয়ে মেজরটি পার্টির নেতা ও বাঙালি জাতির মুখপাত্র হিসেবে একমাত্র বঙ্গবন্ধুরই বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা ঘোষণার' বৈধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল। তাই, বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণা অনুযায়ী ঐ দিন আমাদের স্বাধীনতা দিবস। বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে মুজিবনগর সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার 'সাংবিধানিক ঘোষণা'র পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বৈধ নেতৃত্ব ও আইনগত ভিত্তি লাভ করে।

মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

''যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহবান করেন এবং যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাছাচার ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এবং যহেতু পাকিস্ড়ানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদলের সাথে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং

যেহেতু উলে-খিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখন্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান এবং যেহেতু বাংলাদেশের একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগণিত গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে। এবং যেহেতু পাকিস্ড়ানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে। এবং

যেহেতু জনগণ তাদের বীরত্ব সাহসিকতা ও বিপ-বী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের ওপর তাদের কৃর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এবং

যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিচেনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্ড়রিত করার সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করছি। এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি। এবং

সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য

এতদ্বারা আমরা আরো সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও মূলতবীর ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদশের জনগণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ড় ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরো সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে। আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।"

মুজিবনগর, বাংলাদেশ

১০ই এপ্রিল, ১৯৭১

১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠন বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলার সাত কোটি মানুষের নির্বাচিত সরকার ঐদিন বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দু'শ বছরের জন্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। আবার ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সক্রিয় সাহায্য এবং অন্যান্য বন্ধুদেশের সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সারকথা: *স্বাধীনতা মানুষের চরম ও পরম সম্পদ। স্বাধীনতার জন্য যুগে যুগে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন স্বাধীনতাকামী মানুষ। কোন দেশের স্বাধীনতা আপনা আপনি আসে না। এসেছে আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ। আমাদের দেশের বীর সন্ড়ানেরা কোন ভয়ভীতি বা জেল-জুলুমের কাছে মাথা নত করে নি।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর যৌথ অভিযান কখন শুরু হয়েছিল ?
ক. ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর;
খ. ৪ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর;
গ. ২ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর;
ঘ. ১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর।

২. ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ?
ক. বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান;
খ. তাজউদ্দিন আহমদ;
গ. জিয়াউর রহমান;
ঘ. মাওলানা ভাসানী।

৩. বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীসভা আনুষ্ঠানিকভাবে কখন শপথগ্রহণ করেন?
ক. ১৭ এপ্রিল;
খ. ২৬ মার্চ;
গ. ১২ এপ্রিল;
ঘ. ১৬ এপ্রিল।

৪. কখন বাংলার স্বাধীনতা সূর্য-অস্তমিত হয়-
ক. ১৭৫৮ সালের ২১ জুন;
খ. ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন;
গ. ১৭৫৭ সালের ২০ জুন;
ঘ. ১৭৫৭ সালের ১৭ জুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর্যায়গুলো কি ?
২. স্বাধীনতার ঘোষণাটি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুজিবনগর সরকারের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ক, ৩. ক, ৪. খ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র তথ্যমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার
২. ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, ১৯৯৮
২. জিয়াউর রহমান : স্মারক গ্রন্থ, জানুয়ারী, ১৯৯১